ভূমিকা

জগতের নির্যাসই হল মানুষ। মানুষের জীবনধারায় ও জীবন শৈলীতে সৃষ্টি বহন করে আনে সত্যের স্পন্দন। এই পথ ধরেই মানুষ পৃথিবীতে তৈরী করে নূতন রূপ, রস, ও প্রত্যয়। পৃথিবীর রূপ রসের স্বাদ বিভিন্ন স্রষ্টার কাছে ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। মানব জীবনে তাই প্রতিনিয়ত চলে ভাঙ্গা গড়া। প্রতিমুহূর্ত পূর্ণতা ও অপূর্ণতার দ্বন্দ্বে মুখরিত হয় নবজীবন। এর সঙ্গে সুদীর্ঘকালের ব্যথা বেদনার ইতিবৃত্ত জড়িয়ে থাকে। আবার ক্ষুদ্রতা ও দীনতার ইতিহাস জীবনের ভাঙ্গা গড়ার কাজে যুক্ত থাকে। জীবন শুধু এই অর্থই বহন করে না, নানা কৌণিকতায় জীবনের আকাশে বিভিন্ন ঘটনা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এইসব ঘটনা মানুষের যেদিন থেকে আরম্ভ হয়, গল্পের জন্মও সেদিন থেকে। এই গল্প বলার ধারাপথেই আপন বোধপ্রাণতার ক্রমানুভূতি সূচিত করে সমাজকে। কারণ মানুষের সমাজের সঙ্গে তার বন্ধন শাশ্বত জীবন অভিজ্ঞতারই ফসল। জীবনের এই আলোকে সমাজের প্রতিচ্ছায়া সাহিত্যে রূপায়িত হয়। সাহিত্য সমাজ বিমুক্ত বৃন্তলীন কোন কুসুম নয়, সাহিত্যিকও নন সমাজ বহির্ভূত অলৌকিক জগতের কোনও কল্প মানুষ। তাঁদের সৃষ্টকর্ম সমাজ জীবনে অভিজ্ঞতারই আলোকে নির্মাণ করে এক বাস্তবতা, যা সমাজ অভিজ্ঞতারই শৈল্পিক ব্যঞ্জনামাত্র। তাই সমাজের ঘটনা, জীবন জিজ্ঞাসা ও কামনা বাসনার সমষ্টিগত প্রতিচ্ছায়া সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন রূপে চর্যাপদকে পেয়েছি। আবার পরবর্তীকালে মঙ্গল কাব্যের কবিরা মানুষের পরিপূর্ণতা দিতে পারে নি। সেখানেও অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষের আত্মার ক্রন্দন শোনা গেল। সুতরাং সাহিত্যের জন্ম লগ্ন থেকেই মানুষের জীবন থাকলেও সেখানে দীর্ঘভাবে চরিত্রগুলির বিকাশ লক্ষ করা যায় না। দেব ও মানুষের ভক্তি-নিষ্ঠা, বিরোধাভাসের মধ্যে দিয়ে নূতন জীবন ফুটে উঠতে দেখা যায়। সেখানেও ভক্তির জয়গান করতে যারা মুখর হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা হলেন কবি। তাঁরা কবিতার ছন্দে চরিত্রগুলিকে বিচরণ করালেন। কবির মতো কথাসাহিত্যিকও সত্য অনুসন্ধানে বড় দীর্ঘ অস্বস্তিকর পথ বেয়ে ব্যক্তির অন্তর উন্মোচন করার কাজে মগ্ন থাকেন। মানুষের ব্যক্তিত্ব উন্মোচন কথাসাহিত্যের মধ্যে দেখা যায়। কথাসাহিত্যের চরিত্রগুলি দশ জনের মধ্যে বসবাস করলেও তার আপন ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য কখনও হারিয়ে ফেলে না। তা থেকেই যেকোন চরিত্রের স্বতন্ত্রতা লক্ষ করা যায়। মানুষ যখন নিজেকে চিনতে পারে তখন থেকে উপলব্ধি ও দ্বন্দ্বের তারতম্যই উপন্যাসে দেখা যায়। সেখানে মানুষের জীবনের কাহিনী রচনা করার বিভিন্ন দিক, আর্থিক দুর্দশার ও সামাজিক অবস্থার চিত্র দেখতে

পাই। জীবনের আচার আচরণ ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় উপন্যাসে ফুটে উঠতে দেখি। সুতরাং জীবনের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি উপন্যাস সাহিত্যে প্রাধান্য পায়। সেই জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার সার্বিক রূপ দিতে সৃষ্টি হলো এক নূতন লেখককুল। যাঁরা ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আবির্ভূত হলেন। সমকালের ঔপনিবেশিক শাসনকাল ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি মূলত ইতিহাস ও রোমান্সকে আশ্রয় করে ও স্কেচধর্মী লেখাকে আশ্রয় করে। এরপর রোমান্স ও ইতিহাসকে অবলম্বন করে প্রথম বাংলা উপন্যাসের কায়া নির্মাণ করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় বেরিয়ে এসেছিল বাংলা উপন্যাসের নূতন ডানা, সাহিত্যের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে উড়বার জন্য। তাঁর উপন্যাসে পাওয়া গেল জগৎসিংহ, রাজসিংহ ও চঞ্চলকুমারীদের। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মধ্যযুগীয় নৈতিকতার গন্ডিকে অতিক্রম করতে পারে নি। সমাজের পরিবর্তন ও সংস্কার উপন্যাসে দেখানো হয় নি। বিশেষ করে বিধবার প্রেম তাঁর উপন্যাসে তেমন গ্রহণীয় হয়ে উঠলো না। সামাজিক নিয়মনীতিকে উপেক্ষা করলেও নিরাপত্তার ঘেরাটোপ থেকে চরিত্রগুলির কোন বিচ্যুতি দেখা যায় না। সমাজ শাসনের বহিঃভাগে চরিত্রগুলি যেতে চেয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" (১৯৭৩) ও "রজনী" (১৯৭৮) তে পেয়েছি নারী মনের এই বহিপ্রকাশ। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পটভূমি ইতিহাস ও রোমান্স হলেও ব্যক্তি চরিত্র পেল সমসাময়িক ভাবনার ডানা। সামাজিক উপন্যাস হিসাবে "বিষবৃক্ষ"-তে এই ভাবনার পরিস্ফুটন হয়েছে। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে চরিত্রগুলি চার দেওয়ালের বাহিরে যাবার পথ দেখিয়েছিল। সে পথ ধরেই রবীন্দ্রনাথ হাঁটলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "বৌ-ঠাকুরাণীর হাট" (১৮৮৩ খ্রীঃ) ও "রাজর্ষী" (১৮৮৭ খ্রীঃ) উপন্যাসে ঐতিহাসিক আশ্রয়ে প্রথা ও সংস্কারাচ্ছন্ন জীবন কাহিনী তুলে ধরলেন। তিনি এখানে ঐতিহাসিক ঘটনাকে উপন্যাসের কেন্দ্রে উপস্থাপিত করলেন। এই দুটি উপন্যাসের ঐতিহাসিক বিষয় থেকে বেরিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথের ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে "চোখের বালি" উপন্যাসে দেখা যায় ঐতিহাসিক পটভূমি আর উপন্যাসের কেন্দ্রে নেই, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ও নারীমনের টানাপোড়নের দ্বন্দ্ব এনে বাংলা উপন্যাসকে যথার্থ উপন্যাস সাহিত্যের অঙ্গনে নিয়ে এলেন। ব্যক্তি মনের জটিলতাকে বিনোদিনী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে দেখালেন। "চোখের বালি"তে বিধবা নারী হিসাবে বিনোদিনী সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেতে চায়, কিন্তু সমাজের নিয়ম নীতির কাছে তাকে বলী হতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপন্যাসে চরিত্রগুলির মধ্যে নূতন করে বুনন আনলেন। জীবনের সংঘাত দেখালেন কিন্তু তাতে সমাজ আলোড়নের কোন লক্ষণ ফুটে ওঠে না। আবার "চার অধ্যায়ে" (১৯১৫ খ্রীঃ),

ব্যক্তি মনের বিস্তার লক্ষ্য করা যায়, ঘটনার বিস্তার নেই বললেই চলে। স্বদেশ প্রেমের জায়গায় জীবনের ভাবনার দিকগুলি উপন্যাসে তুলে ধরলেন। সমাজের অবস্থান তাঁর উপন্যাসে ফুটে উঠেছিল। বাস্তবতা থেকে নীতিবোধ তাঁর কথাসাহিত্যে ধরা পড়ল। সাধারণ যুক্তি গ্রাহ্য বিষয়বস্তু তাঁর উপন্যাসে তেমন না থাকলেও উপন্যাসের প্রকৃতি, আঙ্গিক ও প্রকরণের দিকটা নূতন করে পাওয়া গেল। সুতরাং উপন্যাসে জীবনের মাত্রা মূলতঃ সামাজিক পরিবেষ্টনের মধ্যে থেকে নূতন মন ও মানসিকতা নিয়ে চরিত্রগুলি ফুটে উঠল। রবীন্দ্রনাথ বিধবার প্রেমের স্বীকৃতি দিলেন সত্য, কিন্তু সমাজ ভেঙ্গে বা সমাজ সংস্কারের দিকটি দেখালেন না। সমাজের বাঁধাধরা ছকেই চরিত্রগুলিকে চলতে দেখি। এই সময়েই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। উভয় লেখকই উত্তরযুগের আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। প্রভাতকুমার তাঁর উপন্যাসে স্নিগ্ধ পল্লীজীবনের বুকে নিঃস্তরঙ্গ মানুষের জীবন কাহিনী তুলে ধরলেন। ব্যক্তি চরিত্রগুলিকে নূতনভাবে সমাজের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি পুরোপুরি উত্তর যুগের প্রভাব থেকে বেরিয়ে এলেন না। কিন্তু শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব বাংলা কথাসাহিত্যের ধারাকে নূতন পথে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের মতটি উল্লেখ করতে পারি।

"যুগের কিছু কিছু ভাবনা শরৎচন্দ্রের রচনায় রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অনেক স্পষ্ট। মানুষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী প্রত্যয়ের তুলনায় শরৎচন্দ্রের মানবপ্রত্যয় অনেক বাস্তব ঘেঁষা"

(পৃষ্ঠা- ১৩০, বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা/ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০০, প্রকাশক- সুধাংশু শেখর দে, দেজ পাব্লিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩)

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যে চিন্তা শিল্পাদর্শ নিহিত ছিল তা পরবর্তীকালের উপন্যাসে নবজীবনের আভাস দিয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রবীন্দ্র পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি বাস্তব, লোকায়িত জীবন চেতনা, বাঙ্গালী সমাজের সমস্যার বিভিন্ন দিকের পরিচয় উপন্যাসে তুলে ধরলেন। "পল্লী সমাজ" (১৯১৬ খ্রীঃ) এ দেখা যায় গ্রামীণ সমাজের নীচতা, রমা ও রমেশের সম্পর্কের জটিলতার কাহিনী উপন্যাস সাহিত্যে আলাদা মাত্রা এনেছিল। শরৎচন্দ্রের "গৃহদাহ" (১৯২০ খ্রীঃ) এ অচলা ও মহিমের পারিবারিক জীবনের দ্বন্দ্ব ও অবৈধ প্রেমের দিকটা তুলে ধরা হয়েছে। আবার

শ্রীকান্তের আদর্শের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উপন্যাস জগতের নূতন দিকের সন্ধান দেয়। রবীন্দ্রনাথকে গুরুর আসনে বসিয়ে তাঁরই জীবনাদর্শে ও মনস্তত্ত্বে খানিকটা অঙ্গীভূত থেকেছেন বলা যায়। তবুও তাঁর উপন্যাসে চিন্তা ও শিল্পাদর্শ যে নূতনত্বের আভাস দিয়েছিল, তা অভিনব। বস্তুত পক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রভাবেই বাংলা উপন্যাস জগতে নূতন আঙ্গিক, আদর্শবোধ, যুক্তিগ্রাহ্য ও মনস্তত্ত্বসম্মত কাহিনী ও নূতন ভাবনা চেতনা বিকশিত হয়ে উঠেছিল। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়ক নায়িকারা হৃদয়ধর্মী ও উদার মানবিকতার অধিকারী হলেও নীতি নৈতিকতার কাছে তাদের পদে পদে লাঞ্ছিত হতে দেখা যায়। চরিত্রগুলি সমাজের বুকে হাসি কান্নায় ভরা মায়াময় সংসারে চলতে গিয়ে কখনও মানব মনের স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে ফেলেছিল। সেখানে মনন অপেক্ষা সমাজের নিয়ম নীতিতে চরিত্রগুলিকে বেশি নিষ্পেষিত হতে দেখা যায়। চরিত্রগুলি তাই প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারে নি, কিন্তু চিরাচরিত সমাজ শাসন থেকে তারা বেরিয়ে আসতে চায়। অন্ত্যজ শ্রেণীর চরিত্র, গ্রামীণ নিয়ম নীতি, পতিতালয়ের জীবন কাহিনী ও অবহেলিত মানুষদের আচার আচরণ তাঁর উপন্যাসে বার বার এসেছিল। শরৎচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যে এই প্রথম নূতন রুচির সব শ্রেণীর মানুষের জীবন কাহিনী তুলে ধরলেন; যা বাংলা কথাসাহিত্যে অভিনব।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথের কাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ পর্বে ইতিহাস ও রোমান্সই ছিল অধিকাংশ উপনাসের বিষয়। এর মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক উপন্যাসকেও আমরা পেয়েছি। তবে উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে আচার, আচরণ ও স্বভাব বৈশিষ্ট্য, সংস্কারমুখী ভাবনায় আন্দোলিত হতে দেখি না। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি নর-নারীর মনের বিভিন্ন দিকগুলি উপন্যাসে নূতন পথের সন্ধান দেয়। উপন্যাসে নূতন পরীক্ষা নিরীক্ষা তিনি যেন চরিত্রগুলির উপর করেছিলেন। মানুষের যে জৈব ধর্মের তাগিদ ও চাহিদা থাকে তা কোন চরিত্রের মধ্যে আমরা তেমনভাবে দেখতে পাই না। সমাজের বাঁধাধরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিয়ম নীতিতে চরিত্রগুলি যেন আবদ্ধ থেকেছে। এ সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আমাদের নীতি ও আদর্শকে নূতন করে নাড়া দিয়েছিল। অর্থনৈতিক অবক্ষয়, ভগ্ন সমাজে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করল। দেশের সমাজ জীবনে সামাজিক চিন্তা-চেতনার স্তরে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব সংক্রামিত হয়। এই সময়ে ইংরেজ সরকারের শাসন নীতির বিরুদ্ধে গোটা দেশে অস্থিরতার পরিবেশ বিরাজ করছিল। তাদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড দমন নীতি ও বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে দেশবাসীর ঘৃণা প্রবল হয়ে ওঠে। অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার

ধারণ করে। এই পটভূমিকায় মানুষের আবেগের পরিবর্তন ঘটল, চিন্তা চেতনায় বাস্তবের মাটি স্পর্শ করল। মানুষ অনেক বেশি বৈচিত্র্যধর্মিতায় অগ্রসর হতে লাগল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বৈচিত্র্যপূর্ণতা আমাদের সামনে এসেছিল, এদেরকে নবযুগের বার্তাবহ বলতে পারি। এর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ সমাজের বুকে ব্যাপক পরিবর্তন আনল। যা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনী উপন্যাস সাহিত্যে চোখে পড়ে। সমাজের এই অগ্রগতি পদে পদে নগর জীবনের বিভিন্ন দিক উপন্যাসে উঠে এসেছিল। এই সময়েই সমাজের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের রূপটি প্রত্যক্ষ করা গেল। এই চিত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ভয়ঙ্করভাবে আত্মপ্রকাশ করল। সে সময় চাকুরীজীবি মধ্যবিত্তরা সুখের জীবন যাপন করলেও অর্থনৈতিক ভাঙ্গন তাদের বিপর্যয়ের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছিল। তাই মধ্যবিত্ত সমাজের সংকট এই সময়ের লেখকদের রচনার পটভূমি হয়ে দাঁড়ালো। সেই আমল থেকেই বিদেশী শাসকের শাসন ও শোষণ নীতি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনকে বেশী নাড়া দিয়েছিল। এই সময় থেকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অবক্ষয়ের চিত্র এবং শিল্পে মন্দা দেখা দেয়। সর্বোপরি, দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, নৈরাশ্য, জীবন সংগ্রামের অস্থিরতা থেকে সমাজ ও জীবনের সংস্কারের প্রয়োজন বিভিন্ন লেখকের রচনায় ধরা পড়েছে। লেখকরা এই নাগরিক জীবনের উপযোগী করে তোলার ছকে চরিত্রদের সাজিয়ে উপন্যাসের বিষয়ে নর-নারীর হৃদয়ের কামনা বাসনাকে স্থান দিলেন। এই ভাবনা সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই বেশি এসেছিল। এর সঙ্গে উপন্যাসে সমাজের নীচুতলার অধিবাসীদের ছবি আমরা দেখতে পাই। চরিত্রগুলির মধ্যে কুটিলতা, সন্দেহপ্রবণ মনোভাব থাকলেও সমাজকে উপেক্ষা করেই যেন চলতে চায়। সমাজও যেন তাদের শৃঙ্খলে চরিত্রগুলিকে আর বেশি শৃঙ্খলায়িত করতে চায় না। চরিত্রগুলি মুক্তভাবেই চলা ফেরা করে। জীবনের দেহজ আকর্ষণের বাতাবরণে চরিত্রগুলি বিভিন্ন বিষয় উপভোগ করছে। আধুনিক জীবন, কলকাতা শহরের কালচার বুদ্ধদেবের উপন্যাসে প্রাধান্য পেল। ফলে তিরিশ-চল্লিশ দশকের উপন্যাসগুলি যেন শহুরে বৈদগ্ধের আশ্রয় ভূমি হয়ে উঠেছিল। নগর সভ্যতার সামাজিক জীবন, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত যৌন জীবনের নানা সমস্যা উপন্যাসে উঠে এসেছিল। তাদের বিপর্যস্ত সামাজিক জীবন ও তার সমস্যাগুলি সম্পর্কে সমাজকে নীরব থাকতে দেখি। এই বৈশিষ্ট্য ও নূতন জীবনাদর্শের প্রেরণা যারা আনলেন তাঁরা হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু। তাঁদের প্রতিটি উপন্যাসই নিজের জীবন ও তাদের সাহিত্যে নূতন স্বাদ সৃষ্টি করেছিল। জীবনকে ভোগ, কামনা, বাসনা সমাজ অনুশাসন মুক্ত এক উদার

শিক্ষিত মানুষের জীবানাচরণ তাঁদের প্রেরণা দিয়েছিল। এই সময় বাঙ্গালীর যুব সমাজে হতাশার সৃষ্টি হল। বন্ধন মুক্তির দুর্মর আকাঙ্ক্ষা, তাদের যৌবনের উচ্ছলতা লক্ষ করা গেল। এদের সমকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিকরা সমকালীন সাহিত্য পত্রিকা "কল্লোল" এর চিন্তা-ভাবনা থেকে খানিকটা দূরে ছিলেন। কল্লোলীয় ভাবনা থেকে এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার ধারাটি যেন ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। বিশেষ করে তারাশঙ্করের উপন্যাসে রাঢ় বাংলার ক্ষয়িষ্ণু জমিদারি সমাজের ভঙ্গুর অবস্থা লক্ষ করা যায়। তিনি সামগ্রিক যুগকে নিয়ে লিখছেন। বিভূতিভূষণের উপন্যাসেও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ ও মাটির কাছের মানুষদের মৌল বাস্তবতার সংস্কার বিশ্বাস ও স্বপ্ন সম্ভোগের মাঝে জীবনের কঠোর ও কোমল অনুভূতিতে প্রকৃতির ছোঁয়া দেখা যায়। তাঁর উপন্যাসে প্রেমের মার্জিত রুচি আমরা দেখতে পাই। নর-নারীর কামনা ও মানব চরিত্রের কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের দিকটি অপেক্ষা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিশেষভাবে তাঁর উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সমকালের বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সাহিত্য পত্রিকা "কল্লোল"কে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এছাড়া এই সময়ের "কালি-কলম", "প্রগতি" পত্রিকাকে ঘিরে এই পর্বের লেখকদের নূতন জীবনাদর্শ ও চিন্তা চেতনা সম্পর্কে নূতন মূল্যবোধ ধরা পড়েছিল। এই সময়টা মূলত কল্লোলীয় যুগের নূতন বৈশিষ্ট্য। যা সমকালের উপন্যাসের নর-নারীর চিন্তা ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস বলা যেতে পারে। এই কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের বিদ্রোহের উন্মাদনা, নূতনত্বের প্রয়াস, যৌন চেতনা, ভাব প্রবণতা, রোমান্টিকতা ও অতিকাব্যিকতা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। এই নূতন ভাবধারা যারা আনলেন তাঁরা হলেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মণীন্দ্রলাল বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুবোধ ঘোষ, যাঁরা ছিলেন নিজেরাই নিজেদের তুলনা। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন কবি, কেউ ছিলেন গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। এই পর্বের উপন্যাসে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উপর ঝোঁক লক্ষ করা যায়। চরিত্রের মধ্যে রোমান্টিকতা বার বার এসেছিল। বিশেষ করে যৌন উন্মাদনা উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে বেশি মাত্রায় দেখা গেল। তাঁরা কাব্য, কবিতার পাশাপাশি নূতন স্বাদের উপন্যাস রচনা করে সমকালীন কথাসাহিত্যের ধারাটিকে প্রশস্ত করেছিলেন। তাঁদের উপন্যাসে প্রেম চেতনার সঙ্গে দেহ কামনার জটিল সম্পর্কের নূতন তাৎপর্য নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের সংশয় ও সংকটের জটিল দ্বন্দ্ব, রূপ বিন্যাস, নরনারীর প্রেম কামনা ও আনন্দ বেদনার অপরূপ জীবন কাহিনী ফুটে উঠল। প্রবাহমান উপন্যাস ধারার গতিকে ভিন্ন মুখী করার প্রয়াস তাঁদের মধ্যে দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে রোমান্টিক স্বপ্ন কল্পনা এক সুদৃঢ় পারিবারিক ও

সামাজিক দিকগুলি নূতন ভাবাদর্শের আলোয় বিদ্রোহীর ভাব লক্ষ করা যায়। সেই বিদ্রোহের মূল প্রেরণাই হল বুদ্ধদেব বসু। সমকালের "কল্লোল" পত্রিকা এই মুক্তি চেতনাকে আরো বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিল। ব্যক্তির সমস্যা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংশয় ও জীবনের স্বপ্ন গভীরভাবে প্রাধান্য পেল তাঁদের উপন্যাসে। অচিন্ত্যকুমার ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাসে চরিত্রের বিশ্লেষণধর্মী, ঘাত প্রতিঘাত ও মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন দিক লক্ষ করা যায়। তাঁদের উপন্যাসে কাব্য উচ্ছ্বাসের প্রাধান্য থাকলেও চরিত্র পরিকল্পনায় রোমান্টিকতা প্রেমের উন্মত্ত স্রোতের টানে উপযোগী বলে মনে হয়। অচিন্ত্যকুমার ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাসের ভবিষ্যৎ পরিণতির নূতন সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিল। সামাজিক পরিবর্তন দরিদ্র জীবনের নৈরাশ্যের ক্ষোভ ও তার বিদ্রোহ উপন্যাসে দেখতে পাই। বিশেষ করে প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাসে দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি ও সমাজ সংস্কারের প্রতি ঝোঁক লক্ষ করা যায়। তবে অচিন্ত্যকুমারের অনেকগুলি উপন্যাসে বস্তুতান্ত্রিক ও মনস্তাত্ত্বিক চমক লক্ষ করা যায়। উপন্যাসে কোন চরিত্রের মধ্যে দৃঢ় ব্যক্তি সত্তা নেই। এরা যেন আঁধারের মধ্যে নামহীন মানুষমাত্র। অচিন্ত্যকুমারের এই উপন্যাস বলয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের আবির্ভাব ভিন্ন অনুভূতি নিয়ে আসে। অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসে কাব্যের আতিশয্য যতটা ছিল, প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাসে নেই বললেই চলে। তাঁর উপন্যাসে চরিত্রের মধ্যে কোন আদর্শবাদের চিত্র পরিস্ফুট হয় নি, সহানুভূতির বশে নিরুপায় মানুষের বীভৎসতার সংযত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই চিত্র কখনও ব্যঙ্গের সুরে, বর্ণনার ভঙ্গিতে ও কখনও অন্তঃক্ষোভের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এদের মধ্যে সমাজের উদার অনুশাসন মুক্ত শহরকেন্দ্রিক নাগরিক জীবন, প্রেম ও দাম্পত্য প্রেমের চূড়ান্ত পরিণতি উপন্যাস জগতে নূতন আলোড়ন এনেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তিনি উপন্যাসের নূতন ধারায় নূতন বিষয়ধর্মী ও বিতর্কমূলক উপন্যাস লিখে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে চমক এনেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে বিভিন্ন বিষয়ভাবনা ও আঙ্গিক অলোচনা করার আগে তাঁর জীবন কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।